বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 30 JAN 1989
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ... ৬ ...

শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস

শিক্ষা ব্যবস্থা একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের ও ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের হাতিয়ার। দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য জনশক্তির দক্ষতা বাড়ানোর বিশাল দায়িত্ব নির্ভর করে একটি সুন্দর ও শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। আমাদের দেশ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর অন্যতম এবং জীবনযাত্রার মানও পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতির তুলনায় নিম্নস্তরে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে দেশ তথা জনসাধারণের চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ একটি কাযকর শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখার উদ্দেশ্যে শিক্ষাসংস্কারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এসেছে। ১৯৭৩ সাল থেকে শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য বেশ কয়েকটি কমিশন ও কমিটি গঠন করা হয়। শিক্ষার সকল স্তরেই নানাবিধ সমস্যা বিরাজ করছে। এদিকে যেমন শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রতি গুরুত্ব দেয়া দরকার তেমনিভাবে অপরদিকে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব প্রদান অনস্বীকার্য।

বিগত বৎসরগুলোতে শিক্ষাসংস্কার অথবা পুনর্বিন্যাসের চিন্তাভাবনা করা হলেও তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়নি। শিক্ষাক্ষেত্রে যে অবক্ষয় নেমে এসেছে, তার জন্য জাতি তথা অভিভাবকগণ খুবই উদ্বিগ্ন। সবাই আশা করে দেশের জন্য বাস্তবমুখী ও জীবনকেন্দ্রিক একটি শিক্ষাব্যবস্থা থাকা দরকার। তাই শিক্ষার সর্বস্তরে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনের স্থান সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ, পাঠক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি ইত্যাদি এরূপ হওয়া প্রয়োজন যেন শিক্ষার্থীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হয়। এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকা দরকার যা শুধু বর্তমানের চাহিদা মিটাবে না, আগামী ২000 সালের পর উন্নত দেশের সাথে তাল মিলিয়েচলার উপযোগী করে তুলবে। শিক্ষাখাতে ব্যয় মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হয়-যার ফল তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায় না। এর ফলাফল জাতি সাধারণত পরবর্তী পর্যায়ে পেয়ে থাকে। শিক্ষার উন্নয়ন নির্ভর করে দেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর উপর। বর্তমানে জাতীয় আয়ের শতকরা ২ভাগেরও কম শিক্ষাখাতে ব্যয় হচ্ছে। এশীয় অঞ্চলে এর গড় ৩.৫ ভাগ। এ ছাড়াও শিক্ষাখাতে বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দ শতকরা ১০ভাগের কাছাকাছি। এশীয় অঞ্চলের দেশগুলোর গড় হচ্ছে শতকরা ১৩ভাগ।

প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ভিত্তিস্তর যা শিশুর ৬বৎসর থেকে শুরু হয়। কিন্তু দেশে বিশেষ করে শহর ও মহানগরীতে বেসরকারী উদ্যোগে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অপচয় এখনও অব্যাহত রয়েছে। যেমন বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুদের ভর্তি করানো সম্ভবপর হয়নি, যারা ভর্তি হয় তাদের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত না করে বিদ্যালয় ত্যাগ করে। বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পরিবেশও শিশুদের জন্য আকর্ষণীয় নয়। অভিভাবকদের দরিদ্রতা এবং সরকারের অর্থ সম্পদের সীমাবদ্ধতা প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম খুবই তাত্ত্বিক এবং সামাজিক অর্থনৈতিক প্রযুক্তিগত চাহিদার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়নি। উন্নত দেশগুলোতে এ স্তরের শিক্ষা শিক্ষার্থী এবং সমাজের চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ করে করা হয়। যাহোক, বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সকল সমস্যাপূর্ণ দিক রয়েছে সেগুলো হচ্ছে: পাঠদান পদ্ধতি নিম্নমানের, উপযুক্ত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় পাসের হার কম (গড়ে ৫0% এর মত), ভৌত সুযোগ-সুবিধাদির অভাব, গ্রামের ও শহরের শিক্ষার পরিবেশের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান, পাঠক্রম যুগোপযোগী নয়, বিদ্যালয়, দপ্তর ও অধিদপ্তর পর্যায়ে দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। কলেজ শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি রয়েছে। যেমন কলেজ শিক্ষার শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে এবং পরীক্ষা ও শিক্ষাক্রম নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে। অপরিকল্পিতভাবে কলেজ শিক্ষার সম্প্রসারণ হয়েছে। ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষাক্রমে কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে বেকার শিক্ষিত যুবকগণ চাকুরীর সন্ধান না করে স্বনির্ভর হতে পারতো। এছাড়া এ পর্যায়েও শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে। পরীক্ষা ক্ষেত্রে অসাধু পন্থা গ্রহণের প্রবণতা প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। এব্যাপারে সমাজের সচেতনতার অভাব রয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে লক্ষ্য করা গেছে শিক্ষকবৃন্দ ও অভিভাবকদের সমর্থন রয়েছে। ফলে পরীক্ষা কেন্দ্রে শান্তি-শৃংখলার ব্যাঘাত ঘটেছে। এ বিষয়টি জাতির জন্য আত্মঘাতী বললে অত্যুক্তি হবে না।

কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রেও নানারূপ সমস্যা বিরাজ করছে। পাঠক্রম সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদার সাথে খাপখাওয়াতে সক্ষম হয়নি। বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাট অপচয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিল্প কারখানার সাথে এসব প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ নেই বললেই চলে। ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটের ট্রেড কোর্সগুলোতে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সম্প্রতি ডিগ্রীধারী এবং ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত প্রকৌশলীরাও বেকার হয়ে পড়ছে। মানব সম্পদের উপর চাহিদানুসারে তেমন পরিকল্পনা নেই বললেই চলে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং শতকরা ৯৫ ভাগ ব্যয় সরকার থেকে বহন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বাজেট বন্টন ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণসহ আনুষঙ্গিক আরো কিছু বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিয়ন্ত্রণ কমিশনের নিকট খুবই সীমিত।

আমাদের জাতীয় ভাষা বাংলা। কিন্তু ইংরেজী বিদেশী ও দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আবশ্যিক বিষয়রূপে পাঠদান করা হয়ে থাকে। ইংরেজী আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষার মান নিম্নস্তরের। বিদেশের সাথে যোগাযোগ এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংরেজীই প্রধান মাধ্যম। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে ইংরেজীকে বাদ দেয়া যায় না। এ ছাড়া দেশের অভ্যন্তরে উচ্চ শিক্ষা স্তরে বিশেষ করে কারিগরি শিক্ষা ও অন্যান্য পেশাভিত্তিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীতে দক্ষতা না থাকলে পরীক্ষায় ভাল ফল প্রত্যাশা করা যায় না।

সর্বোপরি শিক্ষা ক্ষেত্রে অপচয় ও অবক্ষয় বিরাজ করছে। এর সঠিক মূল্যায়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক ইত্তেফাক ঢাকা : সোমবার, ১৭ই মাঘ, ১৩৯৫

তারিখ ...3.0 JAN 1989...
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 1 ...
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
79-E

(৬ষ্ঠ পৃ: পর)

কারণে বিশেস করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ৪ বছরের পরিবর্তে ৬/৭ বছর লেগে যাচ্ছে। এতে দেশের জনশক্তির উন্নয়নে সময়ের অপচয় তদুপরি অভিভাবকদের অধিক অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ যে সকল দপ্তর/অধিদপ্তর রয়েছে সেগুলোর সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনার উপর মূল্যায়ন করে আরও কার্যক্ষম করা প্রয়োজন। সংস্কার/পুনর্বিন্যাস:

শিক্ষা মন্ত্রণালয় অতীত এবং বর্তমান সমস্যার প্রেক্ষাপটে শিক্ষা সংস্কার/পুনর্বিন্যাসের ব্যাপারে যে সকল চিন্তা-ভাবনা করছে তা এখানে উল্লেখ করা হলো। বর্তমানের শিক্ষা সংস্কারের মূল লক্ষ্য হলো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো অথবা কিছুটা পরিবর্তন এনে কিছুটা যুগোপযোগী করে তোলা। অচিরেই একটি 'জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিল' গঠন করা হইবে। এ ধরনের কোন কাউন্সিল ইতিপূর্বে ছিল না। এ কাউন্সিল গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হল: ভবিষ্যতে যেন শিক্ষা কমিশন অথবা কমিটি গঠন করতে না হয়। এ কাউন্সিল প্রতিনিধিত্বশীল হবে। এ কমিটির মূল দায়িত্ব হবে শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা পূর্বক ভবিষ্যতের সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়া।

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার একটি সহায়ক শিক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করা হবে। এব্যাপারে বেসরকারী উদ্যোগে বেশ কিছু-সংখ্যক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত যে কর্মকাণ্ড চলেছে সে সম্পর্কে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। কারণ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠক্রম বিভিন্ন ধরনের। এর ফলে শিক্ষার্থীদের উপর মানসিক চাপ পড়ছে বলে অভিভাবকদের অভিমত। ২০০০ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার ব্যাপারে যাবতীয় উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। যে সকল এলাকায় বিদ্যালয় নেই অথচ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সে সকল এলাকায় সরকারী অথবা বেসরকারী উদ্যোগে বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। বর্তমানে বিদ্যালয়ের যে সংখ্যা তা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চেয়ে কম। বর্তমান অনুযায়ী প্রতি ২০০০ লোকের জন্য অথবা ২ বর্গ কিলোমিটার এলাকার জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাক্ষরতার ভিত্তি সুদৃঢ় করা সম্ভব। এ উদ্দেশ্যে বর্তমানে শিক্ষা খাতের উন্নয়ন বরাদ্দের প্রায় ৪৬ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ ব্যয়-বরাদ্দ আরো বাড়াতে হবে। দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ লোক পল্লীঅঞ্চলে বসবাস করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষে দরিদ্রতার কারণে অনেকে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে আসে না। তাছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যারা ভর্তি হয় তাদের মধ্যেও কিছু-সংখ্যক বিদ্যালয় ত্যাগ করে। এরা সবাই গ্রামের। এধরনের শিক্ষার্থীদের চাহিদা মেটানোর জন্য শিক্ষাক্রম কর্মমুখী করে পুনর্বিন্যাস করা অপরিহার্য। লক্ষ্য রাখতে হবে বিদ্যালয় ত্যাগী এ দলটি যতটুকু লেখাপড়া করছে তা যেন তাদের জীবনে তথা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহায়ক হয়।

মেয়েদের ভর্তির হার বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শতকরা ৫০ ভাগ শিক্ষক মহিলাদের মধ্য থেকে নির্বাচনের ব্যাপারে আরো উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ যে, উন্নত দেশসমূহে প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকদের অধিকাংশই মহিলা। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ১৭% মহিলা শিক্ষক রহিয়াছেন। এ সংখ্যা ২০০০ সালের মধ্যে ৬০%এ-উন্নীত করা হবে এবং প্রয়োজনবোধে আরো বৃদ্ধি করা হতে পারে। শিক্ষক নিয়োগ নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তন করা হবে। তবে, এর জন্য একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা হবে। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে কিছু-সংখ্যক নির্বাচিত এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে প্রস্তুতি নেয়া হবে। ২০০০ সালের শিক্ষিতের হার ৬০% এ উন্নীত করার লক্ষ্যে ১৯৮৭ সাল থেকে গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। এ কমসূচীকে আরো জোরদারকরণের জন্য বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগকে সরকারীভাবে সমর্থন দেয়া হবে। এছাড়া গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে জাতি গঠনমুলক সকল বিভাগের পাঠ-পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং গণশিক্ষার সাথে ঐ সকল বিভাগের কর্মসূচীর সাথে সমন্বয় সাধন করার ব্যাপারে আন্তঃ-মন্ত্রণালয় ষ্টিয়ারিং কমিটি দিকনির্দেশনা দিবেন। গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের নিকট ন্যস্ত করা হয়েছে। ব্যবহারিক সাক্ষরতার প্রতি বিশেষ জোর দেয়া হবে। এ ছাড়াও থাকবে নব্যশিক্ষিতদের শিক্ষার অনুশীলন এবং প্রয়োজনে পাঠাগার স্থাপন করা হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রামীণ ও শহরের বিদ্যালয়ের মধ্যে যে সুযোগ-সুবিধার ব্যবধান রয়েছে তা কমানোর জন্য সরকার ও সমাজের যৌথ উদ্যোগ অপরিহার্য। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নের নিমিত্তে ১৫০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগার নির্মাণসহ মোট ৩৮০০টি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা ছাড়াও শিক্ষকদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের যে কাজ ইতিমধ্যে শুরু করা হয়েছে তা আরো জোরদার করা হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর পরিবর্তে বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার পরিবেশ উন্নততর করার লক্ষ্যে উন্নয়নমূলক কাজ গ্রহণ করা হবে। গুণগতমানসম্পন্ন বিদ্যালয়ের সংখ্যা গ্রামে যেমন নেই তেমনিভাবে শহরে এবং মহানগরীগুলোতেও এ রকম বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই কম। তাই কিছু সংখ্যক উন্নতমানসম্পন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত) স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে যে সকল এলাকায় সম্ভব সে সকল এলাকায় উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী চালু করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। তবে এর জন্য উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাবে কিনা তার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নৈরাজ্য বিরাজ করছে। উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলীর অভাব, তদুপরি শিক্ষার পরিবেশ সুষ্ঠু নয়, পাসের হার খুবই কম এবং পরীক্ষায় দুর্নীতির প্রবণতা ইত্যাদি প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বর্তমানে পল্লী অঞ্চলে মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকার থেকে স্বীকৃতি দেয়া স্থগিত থাকবে। যে সকল কলেজে শুধু উচ্চ মাধ্যমিক স্তর রয়েছে সেগুলোতে ভবিষ্যতে ডিগ্রীকোর্স খোলার অনুমতি দেয়াও স্থগিত থাকবে। ২১টি পুরাতন জেলার জেলা সদরের কলেজগুলোতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কোর্স চালু করার বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করছে। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তির চাপ হ্রাস পাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নততর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য বর্তমানে শিক্ষা বিভাগের অধীনে ৫১টি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট রয়েছে। এগুলোতে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী পাস, তবে দু' একটি কোর্সের জন্য এস, এস, সির প্রয়োজন। এ শিক্ষায় বর্তমানে যে অপচয় হচ্ছে তা রোধকল্পে প্রত্যেকটি ভিটিআইকে টেকনিক্যাল স্কুলে রূপান্তর করা হবে। সে মোতাবেক পাঠক্রম পরিবর্তন করা হবে। এগুলোতে এস, এস, সি, সমমানের কোর্স প্রবর্তন করা হবে। এখানে যারা পড়বে তারা তিন ধরনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। যেমন, শিল্প-কারখানায় যোগদানের চেষ্টা করতে পারবে অথবা এইচ,এস,সি বিজ্ঞান কোর্সে ভর্তি হতে পারবে অথবা পলিটেকনিক অথবা মনোটেকনিক ইনষ্টিটিউটে ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতে পারবে। মোটকথা তাদের জন্য উচ্চ শিক্ষার পথও খোলা থাকবে। পলিটেকনিক ও মনোটেকনিক ইনষ্টিটিউট এবং প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় যা বর্তমানে বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজী নামে পরিচিত সেখানকার লেখাপড়ার পরিবেশ ও মান আরো উন্নত করার প্রচেষ্টা নেয়া হবে। শিল্প-কারখানার সাথে শিক্ষার্থীদের বর্তমানে যে কোর্সটি চালু আছে তা সঠিকভাবে তদারকীর প্রয়োজন এবং এটি আরো জোরদার করা হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা সনাতনী পদ্ধতিতে চলছে। এর আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বর্তমান পরিকল্পনা মেয়াদে দুইশত মাদ্রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য গবেষণাগার নির্মাণ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমের কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার সাথে মাদ্রাসার শিক্ষা বিভিন্ন স্তরে সমমানসম্পন্ন করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার একটি পূর্ণ মূল্যায়ন দরকার। মাদ্রাসাতে আরবী শিক্ষা আরো জোরদার করতে হবে। যারা ফাজিল ও কামিল পাস করবে তাঁদেরকে আর[illegible] কথোপকথন ক[illegible] যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এর [illegible] মাদ্রাসা শিক্ষকদের উপযুক্ত [illegible]ক্ষণ ও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা [illegible]তে হবে।

বি[illegible]বিদ্যালয় শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র ভ[illegible]তি ও বিভাগ খোলা অপরিকল্পিতভাবে হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয় এবং যে সকল বিষয়ের চাহিদা চাকুরী প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বেশী যে সকল বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীর আনুপাতিকহার অন্যান্য বিভাগের তুলনায় কম। চাহিদার সাথে সংগতি রেখে ছাত্র ভর্তি সীমিত রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তির চাপ কমাতে হবে। তিন বৎসর মেয়াদী স্নাতক কোর্স প্রবর্তন করা

দৈনিক ইত্তেফাক
তাং 30 JAN 1989
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ১ ...

79-F
বাংলাদেশ শিক্ষা ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস

যায় কিনা এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন। পাস ও অনার্স কোর্স এ দু' ধরনের পদ্ধতি থাকবে না। সমন্বিত তিন বৎসর মেয়াদী কোর্স থাকবে যে বিষয়ে নির্দিষ্ট অথবা উচ্চ নম্বর পাবে তাকে সে বিষয়ে সম্মান ডিগ্রী দেয়া হবে। এ বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব তৈরি করতে হবে। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শুধু স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা চালু থাকবে। স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ-গুলোতে চালু করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সংখ্যা বাড়ানো হবে।

দেশে দু'টি অনুমোদনকারী বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল দায়িত্ব হবে কলেজের ডিগ্রী প্রদান এবং পরীক্ষা গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদানের কোন দায়িত্ব থাকবে না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আনয়ন করা হবে। আগামী ২ থেকে ৩ বৎসরের মধ্যে সেশন জট দূরীভূত করে বিশ্ববিদ্যা-লয় শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় রোধ করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। এ ব্যাপারে প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কার্যপ্রণালী পর্যালোচনা করে এর দায়িত্ব আরো সুষ্ঠু ও কার্যকর করা হবে। সবার জন্য শিক্ষা এ উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত উপায়ে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে। প্রাথমিক পর্যায় হিসেবে এ ইউনিভার্সিটিতে কর্মপূর্ব বা কর্মকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে সমা-জের ভূমিকা অনেক কমে গেছে। সমাজের ভূমিকা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ নেয়া হবে। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসর-কারী উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হবে। বর্তমানে বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কিণ্ডারগার্টেন এবং অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ 'ও' এবং 'এ' লেভেল কোর্স প্রদান করছে এর জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

নতুন বেসরকারী শিক্ষা প্রতি-ষ্ঠানে অনুদান প্রদান এবং কোন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়-করণ আপাততঃ স্থগিত থাকবে। অপরিকল্পিতভাবে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সরকারীকরণের ফলে সরকারের রাজস্ব বাজেটের উপর চাপ পড়েছে। এ বিষয়ে অতীতে তেমন চিন্তাভাবনা করা হয়নি, ফলে সমাজের দায়িত্ব কমে যায় এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠা-নের ব্যবস্থাপনা দুর্বল হয়ে পড়ে। সরকারী অনুদান দেয়া নির্ভর করবে পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে এবং বৎসরান্তে তা পর্যালোচনা করা হবে। বিভিন্ন শিক্ষা স্তরে শিক্ষার্থীদের বেতন হার পুনর্বিন্যাসের বিষয়টি চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন সময়ে দেশে মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে তার সংগে সংগতিপূর্ণ করে ইতিপূর্বে কখনো বেতন বৃদ্ধি করা হয়নি।

বেতন বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা নেয়া হবে তার মানে এই নয় যে, এর আয় দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরি-চালিত হবে। মেধাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির হার ও সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। ব্যাংক থেকে গরীব ছাত্রদের লেখাপড়া চালানোর জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা যায় কিনা এ নিয়েও চিন্তাভাবনা করার অব-কাশ রয়েছে। চাকুরী পাওয়ার পর ঋণ গ্রহণকারী শিক্ষার্থিগণ বিভিন্ন কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করার একটি সুস্পষ্ট পদ্ধতি নিরূপণ করা প্রয়োজন হবে। অনেক মেধা-সম্পন্ন ছাত্র পড়ার খরচ চালাতে না পেরে অকালে লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়। ব্যাংক থেকে ঋণদান পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হলে মেধা-সম্পন্ন এ দলটির উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে।

বর্তমানে প্রত্যেক বিষয়ে ১টি করে অনুমোদিত পাঠ্য বই রয়েছে। বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কয়েকটি বই থাকবে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে লেখকগণ শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে বই লেখার অনুপ্রেরণা পাবেন। পরে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ বইকে অনুমোদন দেয়া হবে। ফলে মানসম্পন্ন পাঠ্য বই পাওয়া যাবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড (এনসিটিবি) এর বর্তমান দায়দায়িত্ব আরও সীমিত রেখে শুধু মান-সম্পন্ন বই প্রকাশনার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এবং টেক্সট উৎপাদন এ দুটো ভিন্ন ধরনের কাজ। সেজন্য এনসিটি-বিকে পুনরায় দু'টি সংস্থায় বিভক্ত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ১৯৯০ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যবই উৎপাদন ও বিতরণ বেসর-কারী পর্যায়ে করা যায় কিনা এ বিষয়ে শিক্ষা বিভাগ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এর মূল লক্ষ হবে শিক্ষার্থিগণ যাতে বৎসরের শুরুতেই পাঠ্যবই পেয়ে যায় তা নিশ্চিত করা।

বর্তমানে ইংরেজী তৃতীয় শ্রেণী থেকে পড়ানো হচ্ছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এর মান অনেক নেমে গেছে। ইংরেজী বিদেশী ভাষা এবং দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃত থাকায় এর মান বাড়ানো অপরিহার্য। বিদেশে যারা উচ্চ শিক্ষার্থে যায় তাঁরা ইংরেজীতে ভাল জ্ঞান না থাকাতে ভালভাবে কৃতিত্ব দেখাতে পারছেন না। এ ছাড়াও যাঁরা বিদেশে অধ্যয়ন করতে যায় তাঁদের জন্যও বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের ইংরেজী জ্ঞানের টেষ্ট দিতে হয়। এছাড়া ইংরেজী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক না থাকার দরুন ইংরেজীর মান নিম্নস্তরের। সেজন্য ইংরেজী শিক্ষকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। জ্ঞান বিজ্ঞা-নের জগতে কম্পিউটারের ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। নির্বাচিত কিছু বিদ্যালয়ে কম্পিউটার কোর্স চালু করা যায় কিনা এর প্রতি উদ্যোগ নেয়া হবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়টি সনা-তনী পদ্ধতিতে চলে আসছে। এর মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠা-মোর পরিবর্তন আনতে হবে। এর মূল উদ্দেশ্য হল একটি কার্যকর এবং চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ কর্মপূর্ব এবং কর্মকাল প্রশিক্ষণ কোর্স চালু রাখা। জাতীয় শিক্ষা প্রশাসন, সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট (নিয়েমার) কে পুনর্গঠন-পুনর্বিন্যাস করা হবে। এ প্রতিষ্ঠান শুধু শিক্ষা প্রশাসন ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং বি,সি,এস এডু-কেশন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের কোর্স পরিচালনা করবে। শিক্ষা-ক্ষেত্রে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা জোর-দার করণের নিমিত্তে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের শিক্ষা বিভাগের অধীনস্থ অধিদপ্তর ও দপ্তরসমূহে নিয়োগ করা হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে দুটি অধিদপ্তরে বিভক্ত করার কথা ভাববার সময় এসেছে। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করে এর পুনর্বিন্যাস করতে হবে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ঢাকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি হিসাব রক্ষণ অফিস রয়েছে। প্রত্যেকটি পুরাতন জেলা সদরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি করে হিসাব রক্ষণ অফিস খোলার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। সর্বোপরি শিক্ষার যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণের জন্য শিক্ষা বিভাগে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 30 JAN 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... । ...

দৈনিক ইত্তেফাক ৭

79-G

...প্রবর্তন করা হবে। শিক্ষা বিভাগের অধীনে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট স্থাপিত হয়েছে। এর প্রধান দায়িত্ব হলো অধিদপ্তরগুলোকে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে কারিগরি সহায়তা দান এবং পূর্তকাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন। এ ডিপার্টমেন্টকে আরো কার্যক্ষম করা হবে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো এ প্রতিষ্ঠানটি যাতে নির্ভরশীল এবং বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রদান করতে পারে সেজন্য জোরদারকরণের প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ : উপরে বর্ণিত সম্ভাব্য পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে যে সকল পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে/হচ্ছে সে সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হল :

(ক) ছাত্র-ছাত্রীদের সত্যিকার জ্ঞান লাভ করা এবং পরীক্ষায় দুর্নীতির প্রবণতা রোধের জন্য ১৯৯০ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬০% নৈর্ব্যক্তিক ও বাকী ৪০% রচনাধর্মী প্রশ্ন প্রবর্তন করা হবে। এ ব্যবস্থা এ বৎসর ৮ম শ্রেণী থেকে চালু করা হবে। পরীক্ষায় ব্যাপক নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে উপজেলা সদরের বাইরে মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণেতা ও পরীক্ষক এবং পরীক্ষা পরিচালনার সাথে অন্য যে কোন ভাবে জড়িত ব্যক্তিবর্গ এবং যে সকল শিক্ষকের ছেলেমেয়ে কিংবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় পরীক্ষা দেবে তাঁদেরকে পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত দায়িত্ব দেয়া হবে না। গৃহ শিক্ষকতা করার বিষয়টিও বিবেচনাধীন রয়েছে।

(খ) বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান স্থগিত রাখা হয়েছে। তবে, ক্ষেত্রবিশেষে সরকারী অনুদান ছাড়া স্বীকৃতি প্রদান এবং শ্রেণী খোলার অনুমতি দেয়া হবে। অতীতে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপ্রয়োজনীয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যাও অত্যন্ত কম। এ প্রবণতারোধ করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বীকৃতি ও নবায়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে।

(গ) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের পরিবর্তে শিক্ষার পরিবেশ উন্নততর করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত করার নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি উপজেলায় ১টি বালক ও ১টি বালিকা বিদ্যালয়, ১টি কলেজ এবং ২টি উপজেলায় ১টি করে মাদ্রাসা উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত করা হবে। এর জন্য ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রকল্প নেয়া হবে।

(ঘ) আন্তঃ শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত কাউন্সিলের কার্যাবলী হচ্ছেঃ (১) শিক্ষা বোর্ডসমূহের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন, (২) শিক্ষা বোর্ডসমূহের বার্ষিক কার্যাবলী ও কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা, (৩) বোর্ডসমূহের আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিরসন, (৪) পরীক্ষা পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার সামঞ্জস্য আনয়ন, (৫) বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তঃবোর্ড বদলী ইত্যাদি।

(ঙ) ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি শ্রেণীতে প্রতি বিষয়ে একের অধিক পাঠ্য বই থাকবে। একটি হবে টেক্সট বুক বোর্ডের এবং অন্য দুটি হবে বেসরকারী বই। এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ মান বজায় রাখার জন্য ভাল বই বাছাই করার সুযোগ পাবে। ১৯৮৯ সাল থেকে নবম শ্রেণীতে ও ১৯৯১ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় নীতিনৈতিক/ধর্ম শিক্ষা আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

(চ) ইংরেজী পাঠদান ১ম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ইংরেজী শিক্ষকদের জন্যে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

(ছ) দুটি অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ইহা কিভাবে বাস্তবায়িত হবে সে বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কাজ করছে। এ ছাড়া উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

(জ) বেসরকারী ইংরেজী মাধ্যম স্কুল ও কিণ্ডারগার্টেন স্কুলসমূহের জন্য যে সব বই পড়ানো হয় সেসব বইয়ে যাতে বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অনুভূতির প্রতিফলন হয় সেজন্য উল্লেখিত বই সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটি দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে প্রতি শ্রেণীর জন্য প্রতি বিষয়ের জন্য অনুমোদিত বইয়ের একটি তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে।

(ঝ) মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির গঠন পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির পুনর্বিন্যাস করার বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।

শিক্ষা সংস্কার/পুনর্বিন্যাস-এর বাস্তবায়ন কাজ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এর জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং সর্বস্তরের জনগণের সমর্থন আবশ্যক। রাতারাতি সফল সংস্কার কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। আশা করা যাচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সকল সংস্কার/পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন, অদূর ভবিষ্যতে তা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। বর্তমানে এদেশে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৭৫ হাজার এবং শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে প্রায় ৪লক্ষ ৩০ হাজার এবং ১ কোটি ৬৫ লক্ষ। শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ নির্ভর করে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত সুযোগ-সুবিধা এবং উপযুক্ত শিক্ষাক্রম ও পাঠদানের উপর। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুরোনো এবং সমাজসেবী ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সমাজের ভূমিকা কমে যাওয়ায় এগুলোর পুনঃনির্মাণ/সংস্কারের দায়িত্ব এসে পড়েছে সরকারের উপর।

দু'হাজার সালে এদেশে জনসংখ্যা ১৪ কোটিতে পৌঁছার সম্ভাবনা রয়েছে। তাহলে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পর্যন্ত ৬-২৪ বৎসর বয়সের জনসংখ্যা হবে আনুমানিক ৫ কোটি ৮৭ লক্ষ। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে এক বিরাট পরিকল্পনা হাতে নেয়া দরকার। তার জন্য দরকার হবে বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদের। তবে ন্যূনতম পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা সকলের জন্য নিশ্চিত করা যায় কিনা যা সাংবিধানিক অধিকার সেদিকে লক্ষ্য রেখে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ আবশ্যক। বর্তমানে জাতীয় আয়ের প্রায় ২ ভাগ শিক্ষার জন্য ব্যয় হচ্ছে তা ক্রমশ বাড়াতে হবে যাতে ২০০০ সালে ৫%-এ উন্নীত করা যায়। এছাড়া বর্তমান পরিকল্পনা মেয়াদের মোট উন্নয়ন বরাদ্দের ৪.৬৮% শিক্ষাখাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তা খুবই অপ্রতুল। এ ব্যয়বরাদ্দ ক্রমশ বাড়াতে হবে। তা না হলে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হবে না। প্রস্তাবিত শিক্ষা সংস্কার/পুনর্বিন্যাস বাস্তবায়িত হলে শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে মান উন্নয়ন হবে। ফলে দেশ তথা জাতি সামগ্রিকভাবে উপকৃত হবে।